তৃতীয় অধ্যায়

উদয় শংকর জীবন, অনুপ্রেরণা :

বিংশশতাব্দীতে রাজস্থানের ঝালোয়ার প্রদেশে রাণা ভবানী সিং পণ্ডিত শ্যামশংকরকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন। শ্যাম শংকর সংস্কৃত ভাষায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন এবং বিভিন্ন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কলার বিভিন্ন দিকে তাঁর জ্ঞানকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। তিনি শাস্ত্রীয় সংগীত যেমন রপ্ত করেছিলেন তেমনই যন্ত্রসংগীতেও যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন এবং একই সাথে অভিনয় কলা সম্পর্কেও যথেষ্ট আগ্রহী এবং উৎসাহী ছিলেন। যদিও নৃত্যকলা তাঁর আয়ত্বাধীন ছিল না তবুও নৃত্যকলা তাঁর দৃষ্টির অগোচরে ছিল না বিপরীতে তিনি তাঁর স্কুলের ছাত্রদের নৃত্যশিল্প আয়ত্বের জন্য উৎসাহিত করতেন।

স্বাভাবিকভাবেই শ্যামশংকরের পারিবারিক জীবনেও শিক্ষা সংস্কৃতি ও কলার এই প্রভাব যথেষ্ট পরিমানে পড়েছিল এবং সমগ্র পরিবার সংস্কৃতিমনা হয়ে উঠতে পেরেছিল। শ্যামশংকরের মোট সাত সন্তান। তিনজন শৈশবে মারা যায় জীবিতদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতম হলেন উদয়শংকর। উদয়শংকরের জন্ম ১৯০০ সালের ৮ই ডিসেম্বর। বাড়ীতে সংস্কৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট খোলামেলা পরিবেশ থাকলেও উদয়শংকরের মা হেমাঙ্গিনী দেবী প্রায় গোঁড়া হিন্দু রমনী বলা যায়। এককথায় তিনি ছিলেন কর্তব্যপরায়না স্ত্রী ও জননী। শ্যামশংকরকে চাকরীর সূত্রে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে হতো। তাই উদয়শংকরের ছেলেবেলা কেটেছে মায়ের সঙ্গে নসরৎপুরে মামার বাড়ীতে। তাঁর শৈশবকাল কেটেছে উত্তর প্রদেশ এবং রাজস্থানে এবং সেই কারণেই প্রথাসম্মত বিদ্যালয় কেন্দ্রীক শিক্ষা তার হয়নি। অল্পবয়সেই তাঁকে তিনবার বিদ্যালয় পরিবর্তন করানো হয়। এইকারণেই তাঁর শিক্ষার আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায় এবং বালক উদয় ধৈর্যহীন ও চঞ্চল হয়ে ওঠে। ফলে পরিবারের ক্ষেত্রে এক সমস্যা হয়ে ওঠে। প্রায়ই তার স্কুল পালানো অভ্যাস ছিল এবং সারাদিন মাঠে খেলা করা, গাছে ওঠা, পাখী, কাঠবেড়ালী এদের পিছনে ছোটা-ছুটি করে তার সময় কাটত এবং বিকেলে শান্ত ছেলের মত বাড়ী ফিরে আসাও

অভ্যাস ছিল । এই সময়েই সে শুধুমাত্র মনোরঞ্জনের জন্য বাইজী মহল্লায় যেত তাদের নাচ দেখা ও গান শোনার জন্য। বিস্ময়করভাবে উদয়শংকরের মধ্যে হঠাৎ অঙ্কনের প্রতি ঝোঁক দেখা যায় । প্রথা সম্মত কোন শিক্ষা না পেলেও উদয় এক টুকরো কাঠ কয়লা দিয়ে পশুপাখি, ফুলগাছ ইত্যাদি বাড়ীর দেওয়ালে আঁকার চেষ্টা করত । দাদু অভয়চরণের কাছে এই কারণে বহুবার তাকে তিরস্কৃত হতে হয়েছে । কিন্তু তার আঁকা বন্ধ হয় না । দেওয়াল আর কাঠকয়লা ছেড়ে সে কাগজ পেনসিলের দিকে ঝোঁকে, স্কুলের অঙ্কন শিক্ষক অম্বিকাচরণ মুখার্জী তার প্রতি মনোযোগ দেন এবং উৎসাহিত করেন । অম্বিকাচরণের সংস্পর্শে আসার পর থেকে উদয়শংকরের শিল্পচর্চা প্রথাসম্মতভাবে না হলেও শুরু হয় বলা যায় । তাঁর কাছেই উদয়শংকর অঙ্কন শিক্ষার সাথে সাথে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সাথে পরিচিত হতে আরম্ভ করেন । আর সেগুলির ব্যবহার ও বাজানোর কৌশল রপ্ত করতে থাকেন । আলোকচিত্রের প্রাথমিক পাঠও অম্বিকাচরণের কাছেই উদয়শংকর পেয়েছিলেন । আবার অম্বিকাচরণের যাদুবিদ্যার বেশ কিছু কৌশল আয়ত্তাধীন থাকায় উদয়শংকর সেই কৌশলগুলি সহজেই শিখে নেয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই নিজস্ব কৌশলের উদ্ভাবন করতে আরম্ভ করেন । অম্বিকাচরণের কাছেই তিনি গল্পের মাধ্যমে ভারতীয় মহাকাব্য এবং পুরান সম্পর্কে অবহিত হতে থাকেন । এই বহুমুখী শিক্ষাও সংস্কৃতির জন্যে উদয়ের শিল্পীসত্তা ক্রমশই আরও উৎসাহিত হতে থাকে ।

মা আর দাদুর সাথে উদয় নসরৎপুরে যেখানে থাকতেন তার কাছেই পাবিয়া আর চর্মকারদের বসত ছিল । আর প্রায় প্রতি রাতেই এইখানকার পুরুষদের মধ্যে নাচগান করার প্রথা ছিল । এই সমস্ত মানুষদের মধ্যে একজনের উদয়ের নজর বিশেষভাবে কাড়তো তাঁর স্মৃতিচারণ অনুযায়ী সেই মানুষটির নাম মাতাদীন এবং মাতাদীনের নাচ উদয়শংকরকে যতটা মুগ্ধ করেছিল ঠিক ততখানিই নৃত্যকলায় অনুপ্রানিত করেছিল । এই অনুপ্রেরনার ফলেই বালক উদয়তার

নিজস্ব ভঙ্গিতে মাতাদীনের নাচ অনুকরণের চেষ্টা করত। তার এই সব নৃত্য-ভঙ্গিমা তার মায়ের খুব প্রিয় ছিল। তার মা বিভিন্ন গানের সাথে উদয়কে নিজস্ব খেয়ালে নাচতে উৎসাহিত করতেন। সঠিকভাবে বলতে গেলে, একমাত্র মার উৎসাহেই উদয়ের প্রথম নৃত্যকলার সাথে পরিচয়, যদিও উভয়েই এই কলা সম্পর্কে তখন একেবারেই অনভিজ্ঞ ছিলেন।

১৪ বছর বয়সে উদয়শংকর বাবার সাথে ঝালোয়ারে আসেন এবং ওখানেই বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ঝালোয়ারে থাকাকালীন সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ লক্ষ্য করে তার বাবা একজন বেহালা শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন আর তার অঙ্কন প্রতিভাকে আরও উৎসাহিত করার জন্যে আঁকাশেখার বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। উদয়শংকর বিদ্যালয়ে বিভিন্ন নাট্যানুষ্ঠানে নিয়মিত অংশ নিতেন এবং স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করতেন, কেননা নাচ জানা আর কোনও ছেলে ওই স্কুলে ছিল না। ফলে অনিয়মিত ভাবে হলেও একই সাথে নৃত্যচর্চার সুযোগ উদয়ের জন্যে ঝালোয়ারে আরও বেড়ে যায়। ঝালোয়ারে থাকাকালিন অবস্থাতেই ভারবাহীন দূরের ঝালিয়াকাটানে গাঁচা গবাদিপশুর মেলা দেখার সুযোগ পেয়ে যান তিনি। একটি ক্ষেত্রে গবাপুরের ফসলকাটার উৎসবের সময় উদয়শংকর শহরের প্রধান রাস্তায় একটি বর্ণময় শোভাযাত্রা দেখেন। এই শোভাযাত্রায় একটি হাতীর পিঠে হাওদার নীচে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রীরা বসে বাদ্যযন্ত্র পরিবেশন করছিল। ওই হাতীরই দীর্ঘ দুই দাঁতের ওপর একটি কাঠের পাটা পাতা ছিল এবং সেই পাটাতনের ওপর ঝালোয়ারের সভানর্তকী 'কুকীবাঈ' তার নৃত্য পরিবেশন করছিল। এই সমগ্র দৃশ্যটি উদয়শংকরের চেতনায় এক নতুন অভিজ্ঞতা আর এই অভিজ্ঞতাই তার কল্পনা তথা সৃজনী শক্তি আরও বেশী করে উসকে দিয়ে যায়। রাজস্থানী নারীদের লোকনৃত্য, রাজপুত সেনাদের অসিনৃত্য ও ভীলদের আদিবাসী নৃত্য প্রভৃতির সাথেও উদয় এই সময় পরিচিত হন। এগুলি তাকে অনুপ্রাণিত না করলেও তার মনের এক দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে যায় আর পরবর্তী কালে এই অভিজ্ঞতাই তাকে নৃত্যে নিজস্ব ধারা ও ভঙ্গিমা উদ্ভাবনে সাহায্য করে।

বাবা এবং মহারাজ রাণা ভবানী সিং এর আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতায় প্রচেষ্টায় উদয়শংকর ১৭ বছর বয়সে বোম্বাই এর স্যার. জে. জে. স্কুল অব আর্ট-এ ভর্তি হন । এই স্কুল সে সময়ের ভারতে সবচেয়ে পুরানো শিল্পকলা শিক্ষা কেন্দ্র ছিল । উদয়শংকর এই স্কুলে তার পাঠক্রম সম্পূর্ণ করলেন ১৯২০ সালের মাঝামাঝি । এর কিছুদিন বাদেই উদয় তার বাবার কাছ থেকে লন্ডন থেকে টেলিগ্রাম পান যাতে তিনি নির্দেশিত হন অবিলম্বে লন্ডন যাওয়ার জন্য । ২৩ শে আগষ্ট উদয় বোম্বাই থেকে লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, তখন তার বয়স ২০ বছর । লন্ডন যাত্রার সময় তার মনে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না বাবা কেন তাকে লন্ডনে ডেকেছেন, আর তাই তিনি তার ভবিষ্যত সম্পর্কেও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলেন । তার হয়তো কোন ধারনাই ছিল না যে তার পরবর্তী জীবন কাটবে শুধুমাত্র নৃত্যচর্চা, নৃত্য পরিবেশনা ও নৃত্যশিল্পী হিসাবে ।

লন্ডনে পৌঁছানোর পর উদয়শংকর রয়্যাল কলেজ অব আর্ট এ ভর্তি হন চিত্রকলা বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য । এই কলেজে চিত্রকলা সমস্ত আঙ্গিককে শিক্ষার বিষয় হিসেবে গুরুত্ব দিলেও উদয়শংকরকে সব থেকে বেশী আকর্ষন করেছিলো ক্যানভাসে তেল রঙের মাধ্যম । বিষয় হিসেবে মোটামুটি সব কিছুতেই গুরুত্ব দিলেও তার প্রিয়তম বিষয় ছিলো নৃত্য । পরবর্তীকালে তাঁর তেল রঙের কাজ দেখে উইলিয়াম রোদেনস্টাইন তাঁকে এ মাধ্যম পরিত্যাগ করায় উপদেশ দেন এবং ভারতীয় মিনিয়েচার ফর্মকে নতুনভাবে ধরার চেষ্টা করতে অনুরোধ করেন। এভাবেই উদয়শংকর ভারতীয় শিল্পধারার প্রতি ক্রমেই প্রবাহিত ও অনুপ্রাণিত হতে আরম্ভ করেন।

রয়্যাল কলেজে শিক্ষাক্রমের তিনবছর উদয়শংকর চিত্রকলার জগতে নিমগ্ন ছিলেন । বম্বের স্যার জে. জে. স্কুল থেকেই উদয়শংকরের সাথে নৃত্যের বিচ্ছেদ ঘটে বলা যায় । ছেলেবেলার নাচের দিনগুলোকে তখন নেহাতই শিশুসুলভ খেয়াল বলে তার মনে হতো । এই দীর্ঘসময়ের মধ্যে উদয়শংকর একটি

মাত্র ক্ষেত্রেই নৃত্য পরিবেশন করেন, আর তা হলো ১৯১২ সালের ৩০ শে জুন, লণ্ডনের অভিজাত মহলের আয়োজিত এক ভোজসভায়। তার এই নৃত্য পরিবেশনা দেখে পঞ্চমজর্জ তার মুগ্ধতা প্রকাশ করেন। রয়্যাল কলেজের শিক্ষাক্রম প্রায় শেষ হবার সময়ে উইলিয়াম রোদেনস্টাইন উদয়শংকরের জন্য সে সময়ের চিত্রকলায় সর্বোচ্চ বৃত্তি প্রি দ্য - রোম এর ব্যবস্থা করে দেন এবং উদয়শংকর রোম যাত্রার প্রস্তুতি আরম্ভ করেন। কিন্তু রোম যাত্রার ঠিক আগেই তার জীবনে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায় যার ফলে তিনি চিত্র শিল্পের থেকে নৃত্য শিল্পের অনুরাগী হয়ে ওঠেন এবং পরবর্তী সময়ে এক সার্থক নৃত্যশিল্পী হওয়ার সাধনা সমস্ত জীবন চালিয়ে যান। সেই সময়ে লণ্ডনের হ্যাম্পস্টেডে প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী আনা পাভলোভা তার প্রাচ্য পরিভ্রমন শেষ করে কিছুদিনের বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। প্রাচ্য ভ্রমনের সময়েই পাভলোভা ভারতে আসেন এবং ভারতীয় নৃত্য সম্পর্কে আগ্রহ থাকার কারণে তা দেখার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে সময়ে ভারতীয় নেতিবাচক মানসিকতার কারণে তার ভারতীয় নৃত্য দেখা সম্ভবপর হয়নি। শুধুমাত্র বিভিন্ন গুহা, মন্দির এবং উৎসব দেখেই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। কিন্তু তিনি চেষ্টায় বিরত হন না বরং তাঁর কিছু ব্যালে ভারতবর্ষীয় বিষয়ে করার জন্য আরও বেশী উৎসাহী হয়ে ওঠেন। লণ্ডনে থাকা কালীন তিনি ভারতবর্ষ বিষয়ক তিনটি ছোট আকারের ব্যালের পরিকল্পনা করেন সেগুলি হলো 'অজন্তাফ্রেসকো', 'হিন্দু ওয়েডিং', আর 'কৃষ্ণ এণ্ড রাধা'। 'অজন্তাফ্রেসকো'র পরিকল্পনা পাভলোভার মাথায় আসে অজন্তার কিছু দেওয়াল চিত্র দেখার পর। এই ব্যালের কোরিওগ্রাফির ভার 'ইভনক্লাসচাইনের' ওপর দেন এবং ইভান শুধুমাত্র কিছু আলোকচিত্র ও নিজস্ব কল্পনা শক্তিকে ভিত্তি করে গৌতমবুদ্ধের বোধিলাভের ঘটনাবলীকে ব্যালে মাধ্যমে ধরবার২ চেষ্টা করেন। একইভাবে পাভলোভা 'কৃষ্ণ এণ্ড রাধা' এবং হিন্দু ওয়েডিং সম্পর্কেও কিছু পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য অসম্ভব উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তাঁর প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে ভারতীয় নৃত্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মানুষের অভাব। অর্থাৎ নৃত্যপরিবেশন করবে কে বা কোরিওগ্রাফিতে ভারতীয় ভাবধারার সংযোজনায় সাহায্য করবে কে? এক

ভারতীয় মহিলা শ্রীমতী রেন পাভলোভাকে উদয়শংকরের কথা বলেন আর তারই প্রচেষ্টায় উদয়ের সাথে পাভলোভার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়। এই সাক্ষাৎই উদয়শংকরের জীবন তথা ভারতীয় নৃত্য ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে ওঠে পরবর্তী সময়ে। এরই ভিত্তিতে উদয়ের বোধ যাওয়া আর হয়ে ওঠেনা কোনদিনই, অন্তত চিত্রকর হিসেবে। পাভলোভার সাথে যুক্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে উদয়শংকর পরবর্তীকালে বলেন যে '' আমি জানতাম না ঠিক কাকে বলে ব্যালে, প্রথম কয়েকদিন শুধুমাত্র দলের মহড়া দেখেই কেটে গেলো আর আমিও অবাক্ভাবে বুঝতে শুরু করলাম দলে আমার ভূমিকাটা কোথায়। মাথায় ঢুকতে লাগলো ব্যালের নানা সমস্যা - ভঙ্গি, স্থান, মঞ্চ, বিচরণ এরকম সবই। তবে ভুললে তো চলবে নাযে আমি আসলে চিত্রকর তাই সবসামলে নেবে সাময়িকভাবে কাটিয়ে উঠতে খুব যে বেগ পেতে হয়েছিলো তা নয়। পাভলোভা আমার কাজের জন্য দশজন বড় ও দশজন ছোট মেয়েকে প্রাথমিক ভাবে নির্বাচন করেন। আমি তাদের মধ্যে থেকে আটজনকে বেছে নিই। ভারতীয় সঙ্গীতাংশটি কোমলতা ব্যানার্জী আগেই রচনা সম্পূর্ণ করেছিলেন আর তারপর সমগ্র নৃত্য-কল্পনাটি রূপায়িত করতে আর তেমন সমস্যা দেখা দেয়নি। এভাবেই রচিত ও পরবর্তীকালে উপস্থাপিত হয় 'হিন্দু ওয়েডিং' এবং 'কৃষ্ণ এন্ড রাধা'।

১০ই সেপ্টেম্বর ১৯২৩ রয়াল অপেরা হাউসে অনুষ্ঠিত হ হলো পাভলোভার ছটি নতুন পরিবেশনা 'অজন্তাফ্রেসকো', 'পোলিশ ওয়েডিং', 'ডায়েনিয়াম', 'ওরিয়েন্টল ইম্প্রেসনস', 'রাশিয়ানফোকলোর' আর 'লা-ফিল-মালগারদি'।

প্রথম তিন সন্ধ্যায় দেখানো হয় শুধুমাত্র 'অজন্তাফ্রেসকো', এবং ১৩ই সেপ্টেম্বর 'ওরিয়েন্টাল ইম্প্রেসান' অনুষ্ঠান সূচিতে যুক্ত হয়। ওরিয়েন্টাল

- -

Ref : His dance, his life by Mohan Khokar.

ইম্প্রেশান আসলে তিনটি ছোট আকারের ব্যালের মিলিত রূপ। এই তিনটি যথাক্রমে 'ডান্সেস -অব-জাপান', 'হিন্দু ওয়েডিং' আর 'কৃষ্ণ এন্ড রাধা'। অজন্তাফ্রেসকো অনুষ্ঠানে উদয়শংকরের সংযুক্তি খুব সামান্য এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটি অসাধারণ জাঁকজমকপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ধারায় উপস্থাপিত হলেও দর্শকরা এটিকে আপন করে নিতে পারেন না। একারনেই তিন সপ্তাহ পর অজন্তা ফ্রেসকো অনুষ্ঠান সূচী থেকে বাদ দেওয়া হয়। অন্য দিকে হিন্দু ওয়েডিং আর কৃষ্ণ আর রাধা [illegible] এবং কম জাঁকজমকপূর্ণ হলেও অদ্ভুতভাবে দর্শকদের মধ্যে তা সাড়া তোলে। ওরিয়েন্টাল ইম্প্রেশান সামগ্রিকভাবে যথেষ্ট প্রশংসিত হলেও উদয়শংকরের ভূমিকার প্রতি কেউ-ই সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি। এমনকিঅনুষ্ঠান সূচনিকায়ও তাঁর ভূমিকাকে সহকারী নর্তক হিসাবেই চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই বৈষম্য দিয়েও কিন্তু উদয়শংকরকে দমিয়ে রাখা বাস্তবিক ভাবেই সম্ভব ছিল না কেননা নৃত্যশিল্প তখন তাঁর একমাত্র সৃজনক্ষেত্র হিসাবে পরিগণিত হয়ে গেছে। উদয়শংকর পাভলোভার দলে যোগ দেওয়ার পর প্রায় সারা ইংল্যান্ড জুড়েই 'কৃষ্ণ এন্ড রাধা' ও হিন্দু ওয়েডিং এর উপস্থাপনা হয় এবং বহুল প্রশংসিত শিল্পকর্ম হিসাবে গুণীজন সমাজ তাকে গ্রহণ করে। ১৯২৩ সালে অক্টোবর মাসে পাভলোভার দল আমেরিকায় নৃত্য প্রদর্শনের জন্য যায়। এই ভ্রমন সূচীতে কৃষ্ণ এন্ড রাধা খুব একটা গুরুত্ব না পেলেও ভ্রমনের শেষ অর্ধে 'অজন্তা ফ্রেসকো' তে উদয় আমেরিকার দর্শকদের সামনে উপস্থিত হবার সুযোগ পান। এই সময়েই দলের ব্যালে প্রশিক্ষক উদয়শংকরকে পশ্চিমীধারায় ব্যালে নৃত্যের ভঙ্গিমা শেখাবার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এর ফলশ্রুতিতে উদয়শংকর দলে নিজের গুরুত্বকে কিছুটা তুলে রাখা করে নেন। এরই ভিত্তিতে আরও বেশী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার অনুরোধ নিয়ে তিনি পাভলোভার কাছে গেলে পাভলোভা তাঁকে তীক্ষ্ণ ভাষায় তিরস্কার করেন ও বলেন যে, বিদেশী ব্যালে শেখার আগ্রহ থাকলে উদয় অন্য কোন দলের খোঁজ করতে পারেন, আর পাভলোভা অধিক খুশী হবেন যদি উদয় তার দেশজসম্পদকে পূর্ণ ব্যবহার করে [illegible] ভারতীয় নৃত্যধারাকে পুনোরুজ্জীবিত করার কাজে নিজস্ব নৃত্য প্রতিভাকে নিয়োগ করেন। এই তিরস্কারের ফলশ্রুতিতে উদয়শংকরের মোহভঙ্গ

হয় আর পাশ্চাত্য ব্যালের অনুকরণ ব্যতিরেকে ভারতীয় নৃত্যের উন্নতিসাধন তাঁর একমাত্র অভিষ্ট হয়ে ওঠে ।

ভারতীয় নৃত্যে উদয়শংকরের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলেই প্রাথমিক ভাবে বলতেই হয় যে দীর্ঘকালীন অবক্ষয় আর উপেক্ষার পর ভারতীয় নৃত্যকে প্রথম যথাযথ মর্যাদা আর শৈল্পিক সুষমা মন্ডিত করেন উদয়শংকর । মূলতঃ তিনিই প্রথম শিল্পী যিনি ভারতীয় নৃত্যকে তৎকালীন অর্থাৎ ১৯৩০ এ সংস্কৃতিমনা মানুষের কাছে পৌঁছে দেন । একই সাথে পৃথিবীর মানুষের কাছেও পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রাথমিক দায়িত্বটুকু গুরুত্ব দিয়েই পালন করেন । নতুনধারার নৃত্য শৈলীতে তিনি যে প্রথাগত ধারা, ভঙ্গিমা ইত্যাদি খুঁটিনাটি ব্যাকরণকে ভাঙিয়ে নতুন, একেবারেই নিজস্ব ধারার সৃষ্টি করেছিলেন তা নয় বরং সহজভাবে বলতে গেলে তিনি যা করেছিলেন তা হল নৃত্যের প্রতি মানুষের সম্ভ্রম ও বোঝাবুঝির ক্ষেত্রটিকে আরও বেশী প্রসারিত করা । এই সাফল্যের মূলে রয়েছে তাঁর বিষয়চয়ন, যেগুলি সাধারণভাবে মানুষের কাছে খুব পরিচিত । তাঁর প্রথমদিকের কাজগুলিতে ভারতীয় পুরান-কাহিনী এবং উপকথা বেশী গুরুত্ব পেয়েছে আর এগুলি মানুষের খুবই পরিচিত ছিল । অবশ্য পরবর্তীকালে তিনি সাধারণ মানুষের জীবন-যাপনের বিভিন্ন প্রশ্ন ও সমস্যাকেও বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছেন । এরকমই এক শিল্পকর্ম হলো 'লেবার এন্ড মেশিনারী' যা শিল্পক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহারজাত কারণে সৃষ্ট সমস্যার সঠিক চিত্রায়ন । আবার রিদ্ম-অব-লাইফ' এতে মানুষের জীবন যুদ্ধ, ফসলকাটা বৃষ্টি, এমন প্রকৃতির ছোটখাট বিভিন্ন ঘটনাও বিষয় হিসাবে গুরুত্ব পেয়েছে । এই সমস্ত বিষয়ই সাধারণ মানুষের যথেষ্ট পরিচিত হওয়ার কারণে দর্শককূল দর্শককূল সহজেই এদের মর্মকথা বুঝতে পারত আর তাই তাঁর নৃত্যকর্ম অনেক বেশী সহজবোধ্য হয়ে উঠতো ।

আবার উদয়শংকরই প্রথম যিনি ভারতে পেশাদারী নৃত্য উপস্থাপনার প্রচলন শুরু করেন । তার আগে নৃত্যের উপস্থাপনা মূলতঃ মন্দির

অথবা রাজদরবার কেন্দ্রিক ছিলো । তাই জনসাধারণের মাঝে নৃত্য উপস্থাপনা করাবার দুঃসাহসের প্রশংসা প্রাপ্তিটুকু তাঁরই হয় । একজন চিত্রকর হিসাবে তার নিখুঁত ধারনা ছিল রঙের এবং স্থানের বিষয়ে এবং এগুলিই তাকে সাহায্য করেছিল তার উপস্থাপিত বিভিন্ন শিল্প কর্মকে আরও শৈল্পিকভাবে দর্শকদের কাছে উপস্থাপিত করতে । তাঁর পরিকল্পিত সুদর্শন পোশাকের বিন্যাস এবং রঙের ব্যবহার এক আশ্চর্য সুসামঞ্জস্য আনতে পেরেছিল । মঞ্চে শিল্পীদের নাচের ভঙ্গিমা কিংবা যন্ত্রী এবং সংগীতকারদের বসার স্থান নির্বাচন সব কিছুর মধ্যেই ছিল অদ্ভুত ধরনের শিল্পসম্মত সামঞ্জস্য যার সব কিছুই ছিল তার অঙ্কন বিদ্যার ফলশ্রুতি । তিনিই প্রথম যিনি নৃত্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন বৃন্দবাদন । যদিও এর আগে তিমিরবরণের মত কেউ কেউ বৃন্দবাদনের প্রচলন করেছিলেন কিন্তু তা ছিল শুধুমাত্র সংগীতের প্রয়োজনেই । নৃত্য প্রযোজনার মধ্যে এই ধারাটির সংযোজন করেন উদয়শংকর । এর আগে ভারতের বিভিন্নপ্রদেশের নৃত্যের সঙ্গে শুধুমাত্র সেই প্রদেশের বাদ্যযন্ত্রই ব্যবহার করা হতো । কথাকলিতে ব্যবহৃত হত তার নিজস্ব ঢঙে নিজস্ব ভঙ্গি, কণ্ঠসঙ্গীত, ভরতনাট্যমে ব্যবহৃত হতো মৃদঙ্গ এবং নিজস্ব ঘরানার শাস্ত্রীয় সঙ্গীত । কিন্তু কণ্ঠসংগীত ছাড়া শুধুমাত্র বাদ্য সংগীত বা বৃন্দবাদনকে সঙ্গী করে নৃত্য প্রদর্শিত হবে এমন ধারনা তার শিল্পকর্মের আগে কেউ করে নি । এটাই হচ্ছে নূতন এবং জরুরী বিষয় । উদয়শংকর পাশ্চাত্যের ব্যালের আঙ্গিককে ভারতীয় ব্যালের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করার নজর দেন । ব্যালের নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গীতের ব্যবহার ওতোপ্রোতো ভাবে জড়িত । কিন্তু এই সঙ্গীত মূলত যন্ত্র সঙ্গীত । পাশ্চাত্য ব্যালেতে কণ্ঠসংগীতের ব্যবহার একেবারেই নেই । উদয়শংকরও ভারতীয় ব্যালের ক্ষেত্রে এই ধারাকে অনুসরণ করেছেন । তাঁর অধিকাংশ ব্যালের ক্ষেত্রেই যন্ত্রসঙ্গীত নৃত্যের একমাত্র পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে । দু-একটি ক্ষেত্রে তিনি কণ্ঠের ব্যবহার অবশ্যই করেছেন কিন্তু এতই বিক্ষিপ্ত যে তা একক প্রাধান্য পায়নি বরং যন্ত্রসঙ্গীতের অন্যতর অঙ্গ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে । কণ্ঠের একরকম ব্যবহার সঙ্গীতে কোনো অধিক মাত্রা দিতে পারেনি বরং নাবশ্রিক সঙ্গীত

রচনার অংশ হিসেবেই তা গুরুত্ব পেয়েছে।

যদিও উদয়শংকর জীবনের দীর্ঘসময় বিদেশে কাটিয়েছেন নানাসূত্রে আর পাশ্চাত্যের প্রায় সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল ছিলেন তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবেই ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। এমন কি প্রাচ্যের ইন্দোনেশিয়া, বর্মা ও মালয়েশিয়া ইত্যাদি দেশেও উদয় পরিভ্রমন করেছেন আর সেখানকার বাদ্যযন্ত্র যেমন গং, ড্রাম প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরেছেন, তা সত্ত্বেও তিনি কোনো ব্যালেতেই এসব যন্ত্রের ব্যবহার করেননি। তার ব্যবহার্য সমস্ত বাদ্যযন্ত্রই ছিলো একেবারে ভারতীয় আর তার শিল্পকর্মে বিভিন্ন ড্রামের ব্যবহার বেশী মাত্রায় থাকলেও সেগুলি ছিলো মূলত ভারতের বিভিন্ন লোক ও আদিবাসী ঐতিহ্যের। এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে তিনি কোনরকম ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যেই তখন পর্যন্ত শিক্ষনপ্রাপ্ত হননি। তিনি এর কিছু নিদর্শন দেখেছিলেন মাত্র কিন্তু তিনি সচেতন ছিলেন যে এই নৃত্যধারার হুবহু অনুকরন যেন না হয়। তিনি এনুভবে এনেছিলেন তার নিজস্ব চিন্তা, নিজস্ব কলাকৌশল, নিজস্বশৈলী, নিজস্ব পদচারণা ও ভঙ্গি এবং এগুলি কোনও ভারতীয় নৃত্যধারায় সরাসরি প্রয়োগ বা তা থেকে ধারকরা না হয়েও বর্ণে, গন্ধে, সৌন্দর্যে, চরিত্রে ছিল পরিপূর্ণভাবে ভারতীয়। তার নৃত্যপরিকল্পনার তাল ও ছন্দ ছিল অত্যন্ত সরল। ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যে তালের লয়কারী, ঘোরপ্যাঁচ, আছে পদচারনায় ও ঝংকারে আছে তালকেরতা এবং ছন্দ বিক্ষেপ ও ছন্দ সমৃদ্ধ কিন্তু তিনি এগুলি পুরোপুরি বর্জন করেছিলেন তিনি শুধুমাত্র দর্শকদের সাথে নৃত্যশিল্পীর একটি সেতুবন্ধনের কাজেই তালকে ব্যবহার করেছিলেন যা ছিল দর্শকদের কাছে সহজবোধ্য ও মনোরঞ্জক।